শুদ্ধব্রত দেব

জহর: শুধু ভোজপুরের নন, ভারতীয় বিপ্লবের এক পরিণত নেতৃত্ব

ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট রাজনীতির ইতিহাসে জহর একটি সংক্ষিপ্ত ও অবিসংবাদী অধ্যায়, যে অধ্যায়টি লজ্জাজনকভাবে কম আলোচিত। জহরকে উহ্য রেখে নকশালবাড়ি পরবর্তী বিপ্লবী রাজনীতির ধারাটি নিয়ে আলোচনা করা ততোটাই অসম্পূর্ণ, ঠিক যতোটা জিয়াং শিঙ-কে বাদ রেখে সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে চর্চা। জহর আমাদের কাছে অত্যন্ত জরুরি, চারু মজুমদারের রাজনীতিকে দ্বান্দ্বিকভাবে বুঝবার জন্য। নিম্ন ও মধ্যমেধা শাসিত ভারতের রাজনীতিতে চারু মজুমদারই ছিলেন প্রথম উচ্চমেধার রাজনৈতিক চিন্তানায়ক। চারু মজুমদারের রাজনীতির উচ্চতাকে পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করা এবং দ্বান্দ্বিকভাবে তাকে ব্যাখ্যা ও বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্যেও মেধার উচ্চতার দরকার হয়, যা ছিল সরোজ দত্তের মধ্যে। সরোজ দত্তের মতোই, চারু মজুমদারের রাজনীতির উত্তরাধিকার অর্জন করা ও সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করার প্রশ্নটিতে জহর ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা, ইতিহাস বিপ্লবের প্রয়োজনে যে রকম প্রতিভার জন্ম দেয় এবং যে প্রতিভারা ইতিহাসের গতিমুখকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখেন। খুব কম সময়ের জন্য হলেও জহর ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট রাজনীতির গতিমুখে এক নির্ণায়ক বাঁক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

সি পি আই (এম এল) ধারার রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহী মানুষজনের কাছে জহর পরিচিত ঐতিহাসিক ভোজপুর কৃষক সংগ্রামের রূপকার হিসাবে। এ "কথা অনস্বীকার্য, ছয়ের দশকে নকশালবাড়ি ও শ্রীকাকুলাম, এবং নয়ের দশকে অন্ধ্রপ্রদেশ ও দন্ডকারণ্যের মাঝখানের সময়পর্বে ভোজপুরই ছিল একমাত্র "ব্রেক-থ্রু", এবং জহরের নেতৃত্বেই তা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু চারু মজুমদার যেমন শুধুই নকশালবাড়ির নেতা ছিলেন না, জহরও তেমনই ভোজপুর জেলার স্থানিক নেতা ছিলেন না, ভোজপুর ছিল তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্বের প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র। ভোজপুরের আগুন দেশের অন্যপ্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার সময় জহর পান নি, তার আগেই তিনি শাহাদাৎ

বরণ করেন। কিন্তু ভারতের একটি রাজ্যের, একটি জেলার সংগ্রামের নেতা হিসাবে তাঁকে পরিচিত করানোর অর্থ হলো তাঁর চিন্তননেতৃত্বের পরিসরকে সঙ্কুচিত করা। এর প্রাথমিক দায় অবশ্যই তাঁদের, যাঁরা সেই সময়ে পার্টি কেন্দ্রে তাঁর সতীর্থ ছিলেন এবং পরবর্তীতে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ থেকে সরে এসে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে "লিবারেশন" গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত হন। ভোজপুর সংগ্রামের সাফল্যকে ভাঙিয়ে এই এঁরা বিহারে কিছুদিন জনভিত্তি ধরে রাখতেও সক্ষম হন। সংসদীয় সাফল্যের মুখাপেক্ষী এই গোষ্ঠীটি ভোজপুর সংগ্রামের প্রতি বিপুল জনসমর্থনকে অদূর ভবিষ্যতের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে দেখেছিলেন, সুতরাং সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে জহরের আপোসহীন নেতৃত্বকারী ভূমিকা তাঁদের কাছে খুব সহজপাচ্য ছিল না। খুব সচেতনভাবেই এই গোষ্ঠীটি জহরের তাত্ত্বিক নেতৃত্বের ভূমিকাকে খাটো করে দেখানোর জন্য ভোজপুর সংগ্রামের অনেক শহীদদের একজন মাত্র হিসাবে জহরের নাম ও ছবিকে প্রচার করে এসেছেন; জহর পুনর্গঠিত পার্টির সম্পাদক ছিলেন সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই বলে তিনি যে পার্টি সম্পাদক ছিলেন, কখনও বুড়ি ছোঁওয়ার মতো করে একটি বাক্যে তার উল্লেখটুকু করেই দায় সেরেছেন (এই বক্তব্যের যাথার্থ বোঝার জন্য লিবারেশন গোষ্ঠীর ওয়েবসাইটের একটি পৃষ্ঠাকে পাদটিকায় অবিকল তুলে দেওয়া হয়েছে*)। এখন আমাদের বুঝতে হবে, যে চারু মজুমদার শহীদ হওয়ার পরে যখন দেশ জুড়ে সংগ্রামে প্রবল ধাক্কা এসেছিল, টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া পার্টির কর্মীরা হতাশায় ডুবতে বসেছেন, যখন মনে হচ্ছে আর কিছু নেই, সব শেষ হয়ে গেছে, ঠিক সেই সময়েই ভোজপুর জ্বলে উঠেছিল কী করে। বুঝতে হবে, চারু মজুমদারের সতীর্থ পার্টির প্রথম সারির দিগগজ নেতারা, সি এম-এর "ভুল" ও "হঠকারিতা" নিয়ে মোটা মোটা দলিল লিখতে যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের কেউ কেন ভোজপুরের সমতুল্য আর একটিও ব্রেক-থ্রু ঘটাতে পারলেন না; আর কেনই বা জহরের সতীর্থ পুনর্গঠিত পার্টিকেন্দ্রের নেতারা পরবর্তীতে আর কোনও ভোজপুর সফল করতে ব্যর্থ হলেন। "সাফল্য" বলতে আমরা অবশ্যই কিছু বড় সমাবেশ করতে পারা বা বিধানসভা-লোকসভায় দু'চারটি আসন বের করতে পারার কথা বলছি না, কারণ সে বিচারে তো এদেশে মধ্যপন্থী-দক্ষিনপন্থী "সফল" নক্ষত্রদের অভাব নেই! আমরা বলছি ভোজপুরের মতো একটি ঐতিহাসিক সংগ্রামের কথা, পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও ইতিহাস যাকে নিয়ে আলোচনা করে, একটি মাইলফলক হিসাবে বিবেচনা করে, যা মহাকাব্যের জন্ম দেয়।

কেন জহর ভোজপুর গড়তে পেরেছিলেন? কারণ বিশাল এই দেশের একটি

ছোট অংশে হলেও তিনি পার্টিকে পুনর্গঠিত করতে পেরেছিলেন। এবং তা পেরেছিলেন চারু মজুমদারের রাজনীতিকে শক্ত মুঠোয় ধরে। সেই সময়ে, চারু মজুমদার শহীদ হওয়ার পর মহাদেব মুখার্জিরা যখন জপমন্ত্রের মতো আউড়ে যাচ্ছিলেন 'শ্রদ্ধেয় নেতা কী বলেছেন', জহরই তখন প্রথম বুঝতে চেয়েছিলেন 'শ্রদ্ধেয় নেতা কেন বলেছেন'। সরোজ দত্তের 'চারু মজুমদারের কাছে নাড়া বেঁধেছি' কথার প্রকৃত অর্থ এখানেই। শাহগির্দ যখন উস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে গানের তালিম নেয়, তখন সে কিন্তু উস্তাদের গানের অন্ধ অনুকরণ করে না, উস্তাদকে অনুসরণ করে। কোথায় উস্তাদ সম-এ মেলাচ্ছেন, কোথায় তাকে বন্দিশ-এ বাঁধছেন, বিস্তার-এ ছড়াচ্ছেন কোথায়, কেনই বা লয় দ্রুত বা বিলম্বিত করছেন, এগুলিকে সে লজিক দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে। বাবা আলাউদ্দিনের সব ছাত্রই তো আর আলি আকবর হয়ে ওঠেন না। এই বুঝতে পারার মাত্রাটাই একটি সৃজনশীল ছাত্র আর অনুকরণকারী ছাত্রের ফারাক নিরুপণ করে। চারু মজুমদারকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করা তখনই সম্ভব, যখন 'তিনি কী বলেছেন'-কে অতিক্রম করে 'তিনি কেন একথা বলেছেন' তা উপলব্ধি করা যায়।

'৬৫ থেকে '৭২ - এই সাত বছরে চারু মজুমদার যে ভারতীয় বিপ্লবের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যাবেন, তা তো হতে পারে না। কী ভাবে সমাধান করতে হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গিগত শিক্ষাটা তিনি দিয়ে গেছেন। তার সমসাময়িক যাঁরা চারু মজুমদারকে সঠিক মনে করতেন, তাঁদের তুলনায় জহর এই শিক্ষাটিকে অনেক সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। জহর বলেছিলেন, 'আমাদের জন্য এর অর্থ হলো প্রতিটি সমস্যাকে দেখা, বোঝা ও সমাধান করার ব্যাপারে চারু মজুমদারের দৃষ্টিভঙ্গী (outlook), বিপ্লবী পক্ষ (stand), দৃষ্টিকোণ (view point) ও পদ্ধতি অর্থাৎ চারু মজুমদারের বিপ্লবী মতাদর্শগত লাইনকে আয়ত্ত্ব' করা। এই প্রায়োগিক তাগিদ থেকেই দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে জহর তাঁর যাবতীয় রাজনৈতিক রচনার তাত্ত্বিক সূত্রায়ণ করেছিলেন, যে কারণে তাঁর লেখাগুলি বিতর্কসভার দলিলে আটকে না থেকে এক ভাঙনের কালে প্রয়োগের দিশা হয়ে উঠতে পেরেছিল।

বিপ্লবী লাইনকে আয়ত্ত করার অর্থ শুধু সেই লাইনকে ভালোভাবে অধ্যয়ন করা নয়, সংশোধনবাদী লাইনকে খন্ডন করার মধ্যে দিয়ে তাকে অধ্যয়ন, অনুশীলন ও সারসংকলন করা - জহরের রচনাগুলি তার এক উঁচুমানের দৃষ্টান্ত। জহরের প্রথম প্রকাশিত যে লেখাটি আমরা হাতে পাই ('চারু মজুমদারের বিপ্লবী লাইনের বিজয় জিন্দাবাদ!'), সেটি ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লেখা। এই লেখাটিতে তিনি প্রধানত সি এম লাইনকে "ঠিক" বলে মুখে মেনে তার মধ্যে ভুল খোঁজার

মধ্যপন্থী লাইনের বিরুদ্ধে শাণিত বক্তব্য রাখেন। সেই সময়ে চারু মজুমদারপন্থী সি পি আই (এম এল) রাজনীতির প্রেক্ষিতটা বোঝা দরকার। চারু মজুমদার শহিদ হওয়ার আগে থেকেই অসিত সেন, পরিমল দাশগুপ্ত, সত্যনারায়ণ সিং, সৌরেন বসু, কানু সান্যালদের মতো নেতারা তাঁদের ঘোষিত চারু মজুমদার বিরোধী লাইন নিয়ে পার্টির বাইরে অবস্থান করছিলেন। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে, অর্থাৎ চারু মজুমদার শহিদ হওয়ার চারমাসের মাথায় পঞ্জাবের জগজিৎ সিং সোহল (শর্মা) ও পশ্চিমবঙ্গের মহাদেব মুখার্জিরা একত্রে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠিত করেন। সেই সময়পর্বে রাজনৈতিক লাইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে অমীমাংসিত রেখেই তড়িঘড়ি এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই পর্বে, মূলত লিন পিয়াও প্রশ্নে জহর বিহার রাজ্য লিডিং টিমের পক্ষে পার্টির মধ্যে থেকেই দু লাইনের সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। সোহল-মহাদেবদের এই ধামাচাপা দেওয়া ঐক্য অবশ্য বেশি দিন টেকে নি। এটি দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। জগজিৎ সিং সোহল সুনীতি ঘোষের (তখন "সৌম্য" নামে পরিচিত) সঙ্গে মিলে একটি কেন্দ্রীয় পুনর্গঠনী কমিটির জন্ম দেন যা ঘোষিতভাবে লিন পিয়াও ও অঘোষিতভাবে চারু মজুমদার বিরোধী অবস্থান নেয়, অন্যদিকে মহাদেব মুখার্জির নেতৃত্বে "কেন্দ্রীয় কমিটি" লিন পিয়াও ও চারু মজুমদারের প্রতি "প্রশ্নহীন আনুগত্যের" অবস্থান ঘোষণা করেন। লিন পিয়াও বিরোধী ও চারু মজুমদারপন্থী বিপ্লবী ধারাটির অগ্রণী ভূমিকায় উঠে আসেন জহর। তাঁর কাছে লিন-বিরোধী পক্ষ নেওয়ার অর্থ শুধুই 'লিন পিয়াওকে মানো কি মানো না'-তে আবদ্ধ ছিল না। তিনি তাঁর সংগ্রামকে প্রসারিত করেন পার্টির মধ্যে লিন পিয়াও মতাদর্শের নির্দিষ্ট প্রকাশগুলির বিরুদ্ধে। লিন-বিরোধী সংগ্রামের সূচিমুখকে সুনির্দিষ্ট করে তিনি বলেন, ' মহাদেব এন্ড কোং-এর লাইন হচ্ছে: (ক) রাজনীতিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে যান্ত্রিকভাবে শ্রেণীকে "নেতৃত্বে" আনা – যা অসিত-সৌম্যের লাইনেরই এক নতুন রূপ। (খ) শ্রেণীসংগ্রামের সমস্যা ও দুই লাইনের সমস্যার সমাধান না করে "১৯৭৩-এর মধ্যেই ব্যাপক মুক্তাঞ্চল বানাবই"-এর আহবান দেওয়া। বিপ্লবী কমিটি, ঘেরাও দমনের মোকাবিলা ও এলাকাভিত্তিক শ্রেণীশত্রু নির্মূলীকরণ ও বন্দুক দখল অভিযান সংগঠিত করার সমস্যার সমাধান ছাড়াই "মুক্তাঞ্চলের" আহ্বান দেওয়া, "মুক্তাঞ্চল বানাবই" ও "মুক্তাঞ্চল হয়ে গেছে" বলা। 'শ্রেণীসংগ্রামের নাম নিয়ে শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার করার এ এক নতুন অর্থনীতিবাদী লাইন। এটা লিন পিয়াও-এর সংশোধনবাদী লাইনের নির্দিষ্ট প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়'। এর সাথে সাথে চারু মজুমদারকে রাজনৈতিক লাইনের মর্মবস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে "ভগবান" বানিয়ে গুরুবাদচর্চার লিনপন্থী

ঝোঁকটিকেও তিনি ধারাবাহিকভাবে খন্ডন করে গেছেন। ব্যক্তিপূজার ঊর্ধে উঠে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করার ও সঠিক রাজনীতিকে অগ্রাধিকারে রাখার এই শিক্ষা সে সময়পর্বে বহু বিপ্লবীকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

এর সাথে সাথে সেই মধ্যপন্থী ধারাটির বিরুদ্ধেও জহরকে লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছিল, যে ধারাটি চারু মজুমদারকে ভারতীয় বিপ্লবের মহান নেতা বলে মুখে মেনে কার্যত তাঁর রাজনৈতিক লাইনকে প্রতিটি ক্ষেত্রে বামপন্থী সুবিধাবাদ বলে নাকচ করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মৌলিক নীতি থেকেই সরে আসছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে লিনপন্থী ধারাটি আজ প্রাসঙ্গিকতা হারালেও দ্বিতীয় এই মধ্যপন্থী ধারাটি নকশালবাড়ি ও চারু মজুমদারের নাম ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে টুকরো টুকরো করে আজও সক্রিয়, এবং নিয়মতান্ত্রিক লড়াইয়ের মধ্যে মানুষের একটা অংশকে বেঁধে রাখতে এখনও সক্ষম। তাই মধ্যপন্থী বিলোপবাদের বিরুদ্ধে জহরের রচনাগুলি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রতিটি রচনাতেই তিনি ঘটনা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনাকে কেন্দ্রীভূত করার ভুল প্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঝোঁক ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামকে প্রসারিত করার উপর জোর দিয়েছিলেন। "এক ভেঙে দুই" - "দুই মিলে এক" নয় এবং 'চারু মজুমদারের গ্রেপ্তারি ও হত্যার পেছনকার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কারণ সম্পর্কে' লেখা দু'টি এর উজ্জ্বল উদাহরণ। বিপ্লবী কমিউনিস্ট রাজনীতি নিয়ে এখন যাঁরা লেখালিখি করছেন বা করবেন, তাঁদের এর "মেথডোলজি" অনুধাবন করা উচিত। জহর চারু মজুমদারের রাজনীতির নির্যাসকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন; তাই তিনি বুঝেছিলেন - আমরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরের যুগে বাস করছি, আমাদের কর্তব্য পার্টির মধ্যে (ও নিজেদের মধ্যে) প্রতিনিয়ত সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া। এই মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে "নতুন মানুষ" গড়ে তোলার উপর তিনি যাবতীয় জোর দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর উপলব্ধি ছিল শ্রেণীর মধ্যে থেকে এই নতুন মানুষ গড়ে তুলতে পারাটাই সংগ্রামে সাফল্যের নির্ণায়ক উপাদান।

চারু মজুমদারের অসম্পূর্ণ সামরিক লাইন নিয়ে জহরই প্রথম সংহত ভাবনাচিন্তা ও সূত্রায়ণ শুরু করেন, যদিও ১৯৭৫-এ শাহাদাতের কারণে তিনিও তা চূড়ান্ত করে যেতে পারেন নি। আটের দশকে এসে কোন্ডাপাল্লি সীতারামাইয়া ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট সংগঠকরা সি পি আই (এম এল)-এর সামরিক লাইনের সুসংহত একটা রূপায়ণ করেন এবং ব্রেক থ্রু ঘটান। বস্তুত জহর শহিদ হওয়ার পরবর্তী সময়কালে কে এস ও অন্ধ্রের বিপ্লবীরাই চারু মজুমদারের জীবদ্দশায় অসমাধিত

ভারতীয় বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলগুলিকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করতে ও পরবর্তী স্তরে তার উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। জহরের সামরিক লাইন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি হাস্যকর সমালোচনা আমরা শুনতাম। তা হলো গেরিলা যুদ্ধের পলিসি হলো "হিট এন্ড রান", কিন্তু জহর অনুসরণ করেছিলেন "হিট এন্ড স্টে" নীতি, সে কারণেই ভোজপুরের সংগ্রাম এত ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়েছিল ও ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল। বালখিল্যতারও একটা সীমা থাকা উচিত। "হিট এন্ড স্টে" ঘাঁটি এলাকার রণনীতি। "হিট এন্ড রান" গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল। এই দুইয়ের মধ্যে আদতে যে কোনো আন্তঃবিরোধ নেই, জহরের সমালোচকেরা কি তা জানতেন না? আমাদের ধারণা, জানতেন। জহর শ্রেণীশত্রু খতমের পর্যায় থেকে সংগ্রামকে পরের পর্যায়ে, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পর্যায়ে উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৪ থেকে চলমান শত্রুবাহিনীর উপর আক্রমণের প্রশ্নটিতে তিনি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তার সঙ্গে কষ্টকর উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে লেগে পড়ে থেকে শ্রেণীনেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিতেও। ভোজপুরে চলমান শত্রুবাহিনীর উপর একের পর এক সফল আক্রমণ, টানেলের ব্যবহার বা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘায়িত বুটনরামের মহাকাব্যিক লড়াই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। কাগজের পৃষ্ঠায় মহাকাব্য লেখা যায়। দেশের মাটিতে মহাকাব্যের জন্ম দিতে প্রয়োজন হয় বিপ্লবের বিজয়ে চূড়ান্ত প্রত্যয়, পরিণত রাজনীতিবোধ ও ভবিষ্যতদৃষ্টির। ইতিহাস এর সবকটিই জহরের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল।

'রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস না করে কৃষিবিপ্লব করতে যাওয়ার মানে সোজা সংশোধনবাদ। তাই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার কাজ আজ কৃষক আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান কাজ' - চারু মজুমদারের এই কথার সার বুঝেছিলেন জহর। ভারতের মতো বিশাল দেশে এখানে বা ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে দু একটা শ্রেণীশত্রু খতম করে তবু বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ মানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। তা করলে দিল্লিতে প্রকাশ দফতর খুলে বসে নিরাপদ "সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট" জীবনযাপন করা যায় না। তাই সংশোধনবাদীদের কাছে জহর প্রসঙ্গ আজও খুব একটা সুখকর নয়। আজ যখন ভারতে কমিউনিস্টরা বিশাল আকারের গণমুক্তি গেরিলা বাহিনী, সশস্ত্র গণমিলিশিয়া আর জনগণের বিপ্লবী সরকার সত্যি সত্যি গড়ে তুলে রাষ্ট্রের চোখে 'প্রধান বিপদ' হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, তখন নিয়মতান্ত্রিক পথের পথিক এই দন কিহোতে-দের "বিপ্লব বিপ্লব" খেলা বড়ই শিশুসুলভ ঠেকে। জহর জীবিত থাকলে ওই বিপ্লবী ধারাটির সঙ্গেই তো মিলিত হতেন। আঁকাবাঁকা পথে ওই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুকে নিয়েই তো তিনি শহিদের মৃত্যুর গৌরব বরণ করেছিলেন।